শ্রেষ্ঠ কিশোরগল্প

শ্রেষ্ঠ কিশোরগল্প

ইমতিয়ার শামীম

তাম্রলিপি

শ্রেষ্ঠ কিশোরগল্প
ইমতিয়ার শামীম

গ্রন্থস্বত্ব : অদ্বিতীয়া অপরা চৌধুরী

প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৪৩০, ফেব্রুয়ারি ২০২৪

তাম্রলিপি : ৭৯৫

প্রকাশক
এ কে এম তারিকুল ইসলাম রনি
তাম্রলিপি
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

বর্ণবিন্যাস
তাম্রলিপি কম্পিউটার

মুদ্রণ
মা প্রিন্টিং প্রেস
১৮/২৩ গোপাল শাহ লেন, ঢাকা

মূল্য : ২০০.০০

Srestho Kishoregolpo
By : Imtiar Shamim
First Published : February 2024 by A K M Tariqul Islam Roni
Tamralipi, 38/4 Banglabazar, Dhaka-1100

Price : 200.00 $7

ISBN : 978-984-98737-6-1

শাহবিনার সজল চৌধুরী

প্রিয় সহোদর

শত সহস্র বছর পরমায়ূ হোক তোর

ভূমিকা

শ্রেষ্ঠ বলে কি কিছু আছে? আর যদি থেকেও থাকে, তাহলে তা জোরেশোরে বলতে থাকাটা কি একধরনের অহংকারই ঝাড়তে থাকার সামিল নয়? কিংবা কোনও লেখক ও পাঠকের পক্ষে কি সত্যিই মেপে মেপে বলে দেয়া সম্ভব, –এইটি আমার শ্রেষ্ঠ লেখা? এইটি আমার পড়া শ্রেষ্ঠগল্প? বলা কি সম্ভব, এই পাঁচ-দশটাই আমার সেরা লেখা? যেগুলো পড়লে আমার আর অন্য কোনও লেখাই পড়ার দরকার নেই কারো!

না, সেরকম কখনোই সম্ভব নয়। তারপরও আমরা মাঝেমধ্যে বাছাই করার চেষ্টা করি। যেমন বিছানাপত্র, ঘরদোর ঝেড়েমুছে একটু পরিপাটি করা হয়, তেমনি অনেকগুলো গল্পের মধ্যে কয়েকটিকে বেছে নিয়ে চেষ্টা করা হয় আসলে পাঠকের দুর্লভ পড়ার সময়টুকুকে গভীরভাবে সুন্দর করে তোলার।

অবশ্য আমার সুবিধা হলো,–কিশোরদের জন্যে, এককথায় ছোটদের জন্যে খুব বেশি কিছু লেখা হয়নি। যদিও আমার লেখালেখির হাতেখড়িই ঘটেছিল সেই কৈশোরে, ছোটদের সাময়িকী ও পত্র-পত্রিকায় লেখার মধ্যে দিয়ে। কিন্তু সেসব তো কৈশোরের লেখা–ওসব এখন রেখে দেয়া হয়েছে হিসেবের বাইরে। হিসেবের মধ্যে থাকা যৎসামান্য কয়েকটি গল্প থেকে একেবারেই হাতেগোণা কয়েকটি গল্প নির্বাচন করে প্রস্তুত করা হয়েছে 'শ্রেষ্ঠ কিশোরগল্প'-এর এই সংকলন।

শিশু-কিশোরদের এ সংকলন ভালো লাগলে, সেটিই হবে আমার বড় পাওয়া।

ইমতিয়ার শামীম
ঢাকা। ১৬ মাঘ ১৪৩০, মঙ্গলবার।

আমাদের ব্যোমকেট ডাক্তার	১১
দাদুর কাঠের খড়ম	২৬
যে ভোরে শিউলি ঝরে	৩২
মেঠো চাঁদ ও ইঁদুরের গল্প	৩৭
একদিন হিমেল ভোরে	৪৬
ভূত পুষবে অরিত্রা	৫১
কাজল কাকা ভূত নয়	৫৬
ভূত নয়–ভূতের মতো	৬৩
সূর্যিমামা রাগে কালবোশেখি আসে	৬৯
পাখিরা কেন গাছের কাছে আসে	৭৩

আমাদের ব্যোমকেট ডাক্তার

ব্যোমকেট ডাক্তারের গল্প শোনো।

হাসবার ইচ্ছে হলেই আমরা ব্যোমকেট ডাক্তারের কথা বলাবলি করি। যদিও জানি হাসাহাসি করতে দেখলেই ভাই-বুবুরা পেটন দেবে। আর বাবা-মায়েরা জানতে পারলে ঘাড় ধরে একেবারে বের করে দেবে বাড়ি থেকে।

কিন্তু না হেসে কী করব বলো? ব্যোমকেট ডাক্তার দেখতে এমনিতেই লিকলিকে হিলহিলে পাটশলার মতো; তার ওপর গায়ে চাপান পাঁচমণ ওজনের খেকশিয়াল রঙা জ্যাকেট। দেখলেই মনে হয় আশ্বিন মাসের ছিচকাঁদুনে বৃষ্টিতে একটা মরা ইঁদুর মরে ফুলে ঢোল হয়ে গেছে। আর সেটার পা দুটো যেন গলায় ঢোল ঝুলানোর মোটা দড়ি। তোমরাই বলো, এসব দেখে না হেসে থাকব কেমন করে?

হাসবার মতো আরও অনেক ব্যাপার আছে। অনেকদিন আগে জায়গায় জায়গায় রং উঠে যাওয়া একটি পুরানো কালো সাইকেল কিনেছিলেন ডাক্তার। কিন্তু কালো রং তাঁর পছন্দ নয়। একদিন সকালে দেখা গেল, কোত্থেকে তিনি টেবিল-চেয়ার রং করবার মিস্ত্রি ধরে নিয়ে এসেছেন। পরেরদিন বিকেলবেলা আমরা দেখলাম একটা কটকটে হলুদ রঙের সাইকেল চড়ে রোগী দেখতে চলেছেন ব্যোমকেট ডাক্তার। সাইকেলের হ্যান্ডেলে তাঁর সেই চিরসঙ্গী মাছ ধরার খালই; ওর ভেতরেই থাকে ডাক্তারবাবুর মহাসম্পদ স্টেথিস্কোপ, সুঁই, সিরিঞ্জ, ব্যান্ডেজ আর ওষুধ। সাইকেল চালানো শিখেছেন অল্প ক'দিন হয়, রপ্ত হয়নি কায়দাকানুন, তাই চালাতে পারছেন না ভালো করে। একসময় হঠাৎ সাইকেলটা সড়কের ঢালু বেয়ে নেমে গেল। তারপর আমরা দেখলাম সাইকেল আর ডাক্তারবাবু মাঠের মধ্যে পাশাপাশি শুয়ে আছেন। বোধহয় আকাশ দেখছেন মনোযোগ দিয়ে।

আবার নামটার কথা চিন্তা করো। কী বিচ্ছিরি-ব্যোমকেট। ব্যোমকেশ হলে তাও না হয় মানা যেত। হাজার হলেও দেব-দেবতার নাম। কিন্তু

ব্যোমকেট? ও নামের কোনো অর্থ আছে? ওকে দেখলে হাসি পাবে না তো কি হু হু করে কান্না পাবে?

কিন্তু বড়োদের ব্যাপারই অন্যরকম। তাদের কথা একটাই: ১৫-১৬ মাইলের মধ্যে আর কোনো ডাক্তার নেই। লেখাপড়া জানুক আর না জানুক অসুখ-বিসুখে ব্যোমকেট ডাক্তারই একমাত্র আশা। অতএব তিনি আছাড় খেয়ে পড়ে গেলেও হাসা যাবে না।

ওইদিন ব্যোমকেট ডাক্তার আছাড় খেলেন। আমরা হো হো করে হেসে উঠলাম। এত জোরে হাসলাম, অথচ ব্যোমকেট ডাক্তার তা যেন শুনলেনও না। মাঠের মধ্যে পড়ে রইলেন সাইকেলের পাশে। নড়েন না, চড়েন না। খুব চিন্তা হলো। এতক্ষণ ধরে তো আকাশটাকে দেখার কথা নয়। তাই হাসি থামিয়ে উঠব-উঠব করছি। ঠিক তখনই তিনি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপরই আবার বসে পড়লেন মাঠের ভেতর। তা দেখে আবার আমরা হেসে ফেললাম।

আমাদের ওইভাবে হাসতে দেখে নূরু ভাই আমাদের সেদিন শাসন করেছিলেন। আমাদের মধ্যে কামাল একটু চালাকচতুর। সাহস করে সে তখন বলেছিল, নূরু ভাই, আমরা তো ডাক্তারবাবুর পড়ে যাওয়া দেখে হাসি নাই। ডাক্তারবাবু পড়ে গিয়ে ব্যথা পেয়েছেন দেখে ওখানকার সড়কের ঘাস আর মাটির ঢেলাগুলো কান্নাকাটি করছিল। তাই দেখে হেসেছি।

শুনে নূরু ভাই মহাখাপ্পা। এই কথা বলার শাস্তি হিসেবে কামালকে নূরু ভায়ের সিগারেট কিনতে দোকানে যেতে হলো। টাকাটা অবশ্য নূরু ভাই-ই দিলেন। তবে দোকানটা আধমাইল দূরে। আর সেখানে কামালকে যেতে হলো একা একা।

দুই.

আমাদের গ্রামগুলো ছোটো ছোটো। এ গ্রাম থেকে ডাক দিলে শোনা যায় ও গ্রাম থেকে। কোনো কোনো পাড়া আবার বেশ দূরে দূরে। খেতের ভেতর দিয়ে দু'তিন মাইল হেঁটে পৌঁছাতে হয়। আট-দশটা গ্রামের মধ্যে ইশকুল মাত্র দুটি। একটি প্রাথমিক, আরেকটি উচ্চ বিদ্যালয়। গ্রামের সবাই ইশকুলে পড়তে পারে না। অত টাকাপয়সা কোথায়? তা ছাড়া খেতে ফসল বোনার কাজ করতে হয়। ফসল তুলতে হয়। চরাতে হয় গরু বাছুর। এখন

পর্যন্ত আমাদের কাজলতলী গ্রাম থেকে কেউ এসএসসি পাস করতে পারে নি। আমাদের এপাশে হিজলতলী, ওপাশে ফুলতলী—সেগুলো থেকেও না।

তবে কয়েক বছর হলো পরিস্থিতি একটু পাল্টাচ্ছে। গেল বছর আমাদের বন্ধু কাশেম ক্লাস ফাইভে বৃত্তি পেয়েছে। তার আগের বছর হাশেম ভাই ক্লাস এইটের বৃত্তি পেয়েছে। গ্রামের সবাই উঠে পড়ে লেগেছে—ওদের লেখাপড়া করাবে। কাশেম আর হাশেমের দেখাদেখি অনেকেই লেখাপড়ায় মনোযোগী হয়েছে। ইশ্‌কুলের পড়া শেষ করে তারা কলেজে পড়তে যাবে।

গ্রামের কাছের ছোট্ট একটা রেলস্টেশন থেকে মাটির সড়ক চলে গেছে থানাশহরের দিকে। সেই থানাশহর আবার বিশ মাইল দূরে। ব্যোমকেট ডাক্তার আমাদের এলাকাতে এসেছিলেন ওই সড়ক দিয়ে। একটা ধবধবে মার্কিন কাপড়ের পাঞ্জাবি আর পায়জামা পরে। নাকেমুখে রুমাল ছিল। মাথায় ছিল টুপি। গলায় জরির মালা। আর পায়ে জুতো। তাঁর সঙ্গে আরও অনেক মানুষ ছিল। তাদের কেউ মুরুব্বি। কেউ অল্পবয়সি। কেউবা আমাদেরই মতো ছোটো, ক্লাস ফাইভ-সিক্সে পড়া ছেলে।

আমরা তখন ফাঁকা ধানখেতে খড় দিয়ে বানানো ফুটবল খেলছিলাম। আমাদের ইশ্‌কুলে কোনো ফুটবল নেই। চাঁদা দিয়ে ফুটবল কেনার মতো টাকাপয়সাও নেই আমাদের। এদিকে বর্ষার পানি নেমে গেছে। হেমন্ত ঋতু এসে গেছে। আকাশে শাদা শাদা মেঘ। রাতে ভীষণ সুন্দর জোছনা ওঠে। আমরা সবাই মহা আনন্দে ফাঁকা খেতের ভেতর খেলাধুলা করি। কখনো ফুটবল, কখনো হা ডু ডু, কখনো বা গোল্লাছুট খেলি। জাম্বুরা না পাওয়া গেলে আমরা চুপে চুপে খড়ের পালা থেকে খড় নিয়ে আসি। তাই দিয়ে ফুটবল বানিয়ে খেলি।

খেলা তখন জমে উঠেছে। হঠাৎ বাদল বলে ওঠে, দেখ রে, সড়ক দিয়ে কারা যেন আসছে।

কামাল তখন পায়ে বল নিয়ে গোলপোস্টের কাছে পৌঁছে গেছে। সারা মাঠে ভয়াবহ টেনশন, এই বুঝি গোল হয়ে গেল। কিন্তু কামাল শট মারা বাদ দিয়ে ফিরে তাকায়। তারপর বলে, আজ মোহাম্মদ চাচার মেয়ের বিয়ে। জানিস না তোরা?

শুনে আঁতে ঘা লাগে আমাদের। না হয় কেবল ক্লাস সিক্সে পড়ি—তাই বলে আমাদের কি মর্যাদা নেই? পারবে নাকি সাত গাঁয়ের ভেতর আর কেউ

আমাদের বাদলের মতো ঘুড়ি বানাতে? গত পঞ্চাশ বছরেও কি কাশেমের মতো আর কেউ ক্লাস ফাইভে বৃত্তি পেয়েছে? আর কারো পক্ষে কি সম্ভব হালিমের মতো ওই লম্বা নারকেল গাছে ওঠা? আর কে পারবে কবিরের মতো তালগাছের আগায় উঠে পুকুরের পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়তে? আর আমি,—আমার কথা না হয় ধর বাদই দিলাম। আমরা কি কোনো কাজই পারতাম না? কলার পাতা, দেবদারুর পাতা কেটে আনা, কালিজাবা বাঁশ সুন্দর করে ফালি করে কাটা, সেগুলো দিয়ে বিয়ের গেট সাজানো আমাদের চেয়ে কেউ বেশি জানে নাকি? অথচ আমাদেরই বলা হলো না!

এর একটা মীমাংসা করতেই হবে। আমরা তাই ফুটবল খেলা বাদ দিয়ে গোল হয়ে সভা করতে বসি। আমার বাবা আবার ব্রিটিশ আমলের ক্লাস থ্রি পড়া কৃষক। এ তল্লাটে আর কারোরই হিম্মত হয়নি ওই সময়ে ক্লাস থ্রি পর্যন্ত লেখাপড়া করার। বাবাকে তাই সবাই মান্য করে। সেই হিসেবে এরাও আমাকে মানে, এই সভার সভাপতি বানায়।

গ্রামে দরবার হয় রাতের বেলায়। ইশকুল থেকে বেঞ্চ চেয়ার বের করে মাঠের মধ্যে সাজানো হয়। বাবা বসেন হেডমাস্টারের হাতলওয়ালা চেয়ারে। কিন্তু আমাদের তো সেরকমভাবে দরবার করার সুযোগ নেই। আমি তাই খড় দিয়ে বানানো ফুটবলটার ওপরে মাথার গামছাটা বিছিয়ে একটা উঁচু আসন তৈরি করি। তারপর সবার দিকে তাকিয়ে যতদূর সম্ভব গম্ভীর গলায় বলি, ঘটনাটা কী বলো তো দেখি।

সবাই একসাথে একথার জবাব দেবার চেষ্টা করে। ফলে কারো কথাই আমি বুঝতে পারি না। কয়েকদিন ধরেই দেখছিলাম আমাদের এই ফুটবল খেলার মাঠটার পাশে সরকার বাড়ির সুন্দর মোরগটা সারাদিন ধরে ঘোরাফেরা করছে। আর চেষ্টা চালাচ্ছে সাদার মধ্যে লাল কালো ফুটকি তোলা মুরগির সাথে ভাব জমানোর। ঝোপঝাড়ে, ঘাসের ফাঁকে কিংবা ধানের মুথার মধ্যে পোকা দেখতে পেলেই মোরগটা আস্তে আস্তে আদুরে গলায় কো কো করে মুরগিটাকে ডাকে। কখনো আবার ধূসর ঝুরঝুরে ধুলাবালির মধ্যে বসে বোঝানোর চেষ্টা করে—এইখানে বসে তুমি গোসল করতে পারো। তোমার ডানা আর পুচ্ছ, বুকের কাছের পালক তাতে আরও সুন্দর হয়ে উঠবে। হইচই এত বেড়ে যায় যে সেই মোরগটা ভয় পেয়ে মুরগিকে ফেলে রেখেই দৌড় দিয়ে ওঠে সড়কের ওপরে।

ভীতু মোরগটার দৌড় দেখে আমার হাসিতে ফেটে পড়ার ইচ্ছে করে। কিন্তু কোনো উপায় নেই। আমি এই সভার সভাপতি। হইচই শুনে তাই আরও গম্ভীর আর কড়া গলায় বলি, গোলমাল করো না। একজন একজন করে কথা বলো।

সবাই একে একে রিপোর্ট করে। হালিম বলে, বিয়ে ঠিক হয়েছে তিন মাস আগে। সেই গ্রীষ্মকালে।

কবির জানায়, পাত্র কম্পাউন্ডার। মোটামুটি চার ভাই। সবাই হালচাষ করে।

বাদল বলে, তবে মোহাম্মদ চাচা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, তার একটাই সন্তান। ছেলেকে তাই ঘরজামাই থাকতে হবে।

বলেই সে ফিক করে হেসে ফেলে। সকলেই হাসতে থাকে। সবাই যেহেতু হাসছে, তাই আমিও একটু হাসি। তারপর বলি, জামাই ঘরে থাকুক আর বাইরে থাকুক, তাতে আমাদের কিছু আসে যায় না। সোজা কথা আমাদের কোনো পাত্তা দেয়নি মোহাম্মদ চাচা। এর একটা বিহিত করতে হবে। কামাল, তোর বাড়ি তো সুপারি গাছে ভরা। খান বিশেক পাকা ছুলানো সুপারি নিয়ে আয় তো।

সুপারি আনার কথা শুনেই ওরা বুঝতে পারে, আমি কী করতে চলেছি। সবাই উল্লাসে ফেটে পড়ে। আমি আড়চোখে সড়কের দিকে তাকাই। দেখি সরকার বাড়ির মোরগটা তখনো দাঁড়িয়ে আছে। হয়তো ও চাইছে ফিরে আসতে, কিন্তু আসার সাহস পাচ্ছে না।

তিন.

পথের দুই ধারে বাঁশবন। সে বন পেরুলে সারি সারি ছনের ঘর, বড়ো জোর দু-একটা টিনের ঘর। ঘরবাড়ির ফাঁকফোকরেও দু-চারটে বাঁশঝাড়। এই নিয়ে ফুলতলি গ্রাম। ডানদিকের বাঁশবনটার শেষে মোহাম্মদ আলী চাচার বাসা।

সরু একচিলতে আঁকাবাঁকা পথ বাঁশবনের ভেতর। ঝরে পড়া হলুদ হলুদ বাঁশপাতা শুয়ে আছে গা এলিয়ে। পা পড়তেই মচমচ করে ওঠে। তার ওপর দিয়ে আমরা মোহাম্মদ আলী চাচার বাসায় গিয়ে উঠি।

যেতে খুব খারাপ লাগে। না হয় আমরা কেবল ক্লাস সিক্সে পড়ি; তাই বলে বিয়ের দাওয়াত দেবে না! যেভাবেই হোক মোহাম্মদ আলী চাচাকে জব্দ করতে হবে। খারাপ লাগলেও আমরা তাই উঠোনে গিয়ে দাঁড়াই।

আর খানিকবাদেই সন্ধ্যা নামবে। বাড়ির বাইরে তাই একটা হ্যাজাক জ্বালানো হয়েছে। বাড়ি বলতে একটা টিনের আর দুইটা ছনের ঘর—ছনের একটিতে আবার রান্নাবান্না চলে। বাইরে বাঁশবন ঘেঁষে একটা বাঁশের ছাউনি। ওটাই চাচার গোয়ালঘর।

আমাদের গ্রামে বিয়ে হলে বাড়ির সামনে একটি বড়ো চকি পাতা হয়। চকির ওপর থাকে দুটো হাতলওয়ালা চেয়ার। বাবা-মায়ের ঘরের মধ্যে কনেকে কবুল পড়ানো হয়। বরকে কবুল পড়ানো হয় বরযাত্রীদের বসতে দেয়ার ঘরে। তারপর বর আর কনেকে নিয়ে এসে বসানো হয় ওই চকির উপর। আবার কেউ বিয়ে করে বউ নিয়ে এলেও প্রথমে ওই চকির ওপর বসে। সবাই তখন বর-কনেকে একসঙ্গে দেখে। বর আর কনের সামনে আয়না ধরা হয়, সেই আয়না দিয়ে তারা দুজনও একজন আরেকজনকে দেখে। গ্রামের মেয়েরা তখন বিয়ের গান গেয়ে ওঠে। গান শেষ হলে বর-কনে নেমে আসে চকির ওপর থেকে। চকির কাছে থেকে বাসরঘর পর্যন্ত লম্বা শাড়ি বিছানো থাকে। শাড়ির ওপর ছড়ানো থাকে পেঁয়াজ, মরিচ, রসুন, তেজপাতা, কড়ি ও ঝিনুক। বর মহাশয় সেসব কুড়িয়ে কুড়িয়ে তুলে দেয় কনে বিবির আঁচলে। তারপর ঘরের ভেতর গিয়ে দাঁড়ায়। তখন আত্মীয়স্বজন পাড়া প্রতিবেশীরা আসে। বয়সে বড়ো হলে বর-কনেরা সালাম করে, ছোটো হলে হাত ধরে দোয়া করতে বলে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সবাই বর-কনের কাবিন ও কলেমা পড়া নিয়ে মহাব্যস্ত হয়ে ওঠে। এই ফাঁকে আমরা আমাদের কাজ সেরে ফেলি। বিয়ে পড়ানোর পর বর-কনেকে চকির ওপর নিয়ে আসে সবাই। বর-কনে চেয়ারে বসতেই পায়ার নিচে রাখা গোল সুপারি ঘুরে ওঠে। আর চেয়ারশুদ্ধ ধপাস করে চকির ওপর পড়ে যায় দুজনে।

তাই দেখে আমার বাবা হায় হায় করে ছুটে আসেন। লাফ দিয়ে ওঠেন চকির ওপর। বাবা আবার বগিলা খড়ম পড়তে খুবই ভালোবাসেন। চেয়ারের পায়ার নিচ থেকে গড়িয়ে আসা একটা সুপারি খড়মের নিচে পড়ায় বাবাও হুমড়ি খেয়ে চকি থেকে গড়িয়ে পড়েন উঠানটাতে।

হাজার হলেও আমার বাবা ব্রিটিশ আমলে ক্লাস থ্রি পাশ করেছেন! কতজনকে দেখেছি 'হোয়াট ইজ ইওর নেম?' বলে বাবা ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়ে দিয়েছেন। সেই বাবার এই দশা! দেখে আমার খুবই খারাপ লাগে। আমি তাঁকে টেনে তুলি।